অধ্যায় - ৪২

মহাসমাধির দিকে (১)

পূর্ব্বাভাস, রামচন্দ্র দাদা পাটীল এবং তাত্‌য়া কোতে পাটীলের মৃত্যু এড়ানো, লক্ষ্মীবাঈ শিন্দেকে দান, শেষ মুহূর্ত।

প্রস্তাবনা ঃ-

গত অধ্যায়ের ঘটনাগুলি হ'তে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে গুরু-কৃপার কেবল একটি রশ্মি ভবসাগরের ভয় থেকে মুক্ত করে দেয় এবং মুক্তির পথ সুগম ক'রে দুঃখকে সুখে পরিবর্ত্তিত করে। যদি সদ্‌গুরুর মোহবিনাশকারী পূজণীয় চরণ দুটি সর্বদা স্মরণ করতে থাকো তাহ'লে তোমার সমস্ত কষ্ট এবং ভবসাগরের দুঃখ শেষ হয়ে যাবে। তাই যারা নিজের কল্যাণের জন্য চিন্তিত তাদের সাই সমর্থের অলৌকিক মধুর লীলামৃত পান করা উচিত। এই ভাবে তাদের মন শুদ্ধ হবে। প্রারম্ভে ডাক্তার পণ্ডিতের পূজো এবং কিভাবে উনি বাবাকে ত্রিপুন্ড লাগিয়ে ছিলেন এর উল্লেখ মূল গ্রন্থে করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গের বর্ণনা ১১-ই অধ্যায়ে করা হয়ে গেছে, তাই এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা উচিত নয়।

পূর্ব্বাভাস

পাঠকগণ, আপনারা এতদিন শুধু বাবার জীবনের কাহিনী শুনেছেন। এবার আপনারা মন দিয়ে বাবার মহাপ্রয়ানের কাহিনী শুনুন। ২৮সেপ্টেম্বর, ১৯১৮ বাবার সামান্য জ্বর হয়। এই জ্বর দু-তিন দিন থাকে। এরপর বাবা খাওয়া-দাওয়া একেবারে বন্ধ করে দেন। তাতে ক্রমশঃ তাঁর শরীর রুগ্ন ও দুর্বল হয়ে গেল। ১৭ দিন পর অর্থাৎ ১৫-ই অক্টোবর, ১৯১৮ বেলা দুটো বেজে তিরিশ মিনিটে তিনি এই দেহ ত্যাগ করে চলে গেলেন (এই সময়টি প্রোফেসর জি. জি. নারকের পত্রের অনুসারে লেখা হয়েছে। এই পত্রটি উনি ৫.১১.১৯১৮ তে দাদা সাহেব খাপার্ডেকে লিখেছিলেন এবং সেই বছর সাইলীলা পত্রিকার ৭-৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল)। এর দু-বছর আগে বাবা তাঁর লোকান্তর গমনের পূর্ব্বাভাস দিয়েছিলেন, কিন্তু তখন কেউই বুঝতে পারেনি।

ঘটনাটি এইরূপ - বিজয় দশমীর দিন যখন সবাই সন্ধ্যার সময় বিসর্জনের পর ফিরছিল, তখন বাবা হঠাৎই রেগে ওঠেন। মাথার কাপড়, কফ্নী এবং কৌপীন খুলে সেগুলিকে টুকরো টুকরো করে জ্বলন্ত ধুনিতে ফেলে দেন। বাবার দেওয়া আহুতি পেয়ে ধুনি দ্বিগুণ জোরে জ্বলে ওঠে এবং বাবার মুখের প্রভা তার চেয়েও উজ্জ্বল মনে হচ্ছিল। তিনি পূর্ণ নগ্নবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন এবং তাঁর চোখ দুটি জ্বলন্ত অঙ্গারের মত লাল। তিনি আবেশে চিৎকার করে বলেন- "তোরা এখানে আয়। আমায় ভালো করে দেখে নে, আমি হিন্দু না মুসলমান।" সবাই ভয়ে কাঁপছিল। কেউ তাঁর কাছে যেতে সাহস করল না। কিছুক্ষণ পর ভাগোজী শিন্দে (যিনি মহারোগে ভুগছিলেন) সাহস করে বাবার কাছে যান এবং কোনরকমে তাঁর কৌপীনটি বেঁধে বলেন- "বাবা! এ কি কথা? দেব, আজ যে দশমীর উৎসব।" তাতে তিনি নিজের দন্ডটা মাটিতে ঠুকে বলেন- "এটা আমার সীমোল্লঙ্ঘন।" প্রায় রাত ১১-টা পর্যন্ত তাঁর রাগ শান্ত হয় না এবং ভক্তদের 'চাওড়ী' শোভাযাত্রা বেরোবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ হচ্ছিল। এক ঘন্টার পর বাবা শান্ত হন এবং পোষাক-আশাক পরে 'চাওড়ী' মিছিলে সম্মিলিত হন। এই ঘটনাটির মাধ্যমে বাবা ইঙ্গিত দেন যে তাঁর পক্ষে জীবন-রেখা পার হয়ে যাবার 'দশেরা' বা 'বিজয়া-দশমী'ই উচিত দিন। কিন্তু সেই সময় কেউ তার আসল অর্থ বুঝতে পারেনি। বাবা আরোও অনেক আভাস দেন। যেমন -

রামচন্দ্র দাদা পাটীলের মৃত্যু এড়ানো ঃ-

এর কিছুদিন পর রামচন্দ্র পাটীল খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। উনি খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। সব রকমের চিকিৎসা করা হয় কিন্তু কিছুতেই লাভ হয় না। হতাশ হয়ে মৃত্যুরূপী শেষ মুহূর্তের জন্য প্রতীক্ষা করতে শুরু করেন। সেই সময় একদিন মাঝরাতে বাবা ওঁর মাথার কাছে এসে দাঁড়ান। পাটীল ওঁর পা জড়িয়ে ধরে বলেন- "আমি বাঁচার সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়েছি। এবার কৃপা করে আমায় বলুন আমার প্রাণ কখন বেরোবে?" দয়াসিন্ধু বাবা বলেন- "চিন্তা কোর না। তোমার 'হুন্ডী' ফেরত নিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তুমি খুব শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবে। আমার শুধু তাত্য়ার জন্য ভয় হচ্ছে - ১৯১৮ সালে 'বিজয়া-দশমী'র দিন সে দেহ ত্যাগ করবে। কিন্তু এই কথাটা কাউকে বোল না এবং ওকেও জানিও না। ও তাহলে ভয় পেয়ে যাবে।" রামচন্দ্র এরপর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন কিন্তু ওঁর তাত্য়ার জন্য ভয় হত। উনি জানতেন যে বাবার কথা কখনো মিথ্যা হয় না এবং দু-বছর পরই তাত্য়ার মৃত্যু অবধারিত। উনি এই

কথাটি বালাশিম্পী ছাড়া কাউকে জানান নি। দুটি ব্যক্তি - রামচন্দ্র দাদা এবং বালাশিম্পী তাত্য়ার জীবন সম্বন্ধে চিন্তাগ্রস্ত এবং আশঙ্কান্বিত ছিলেন।

রামচন্দ্র বিছানা ছেড়ে চলতে-ফিরতে শুরু করেন। সময় খুব তাড়াতাড়ি কেটে যায়। ১৯১৮ সালে ভাদ্রমাস্ শেষ হয়ে আশ্বিন মাস শুরু হবে, এমন সময় বাবার কথা পুরোপুরি সত্য প্রমাণিত হয়। তাত্য়া অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। ওঁর অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। উনি বাবার দর্শন করতেও যেতে পারতেন না। তাত্য়ার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বাবার উপর এবং বাবার শ্রীহরির উপর, যিনি তাঁর সংরক্ষক। তাত্য়ার অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপের দিকে গেল। এখন উনি আর নড়তে-চড়তেও পারতেন না এবং সর্বদা বাবাকেই স্মরণ করতেন। এদিকে বাবাও জ্বরে ভুগছিলেন এবং তাঁর অবস্থাও দিনের-পর-দিন শোচনীয় হতে লাগল। তারপর নির্দ্ধারিত 'বিজয়া-দশমী'র দিনও কাছে এসে পড়ল। তখন রামচন্দ্র দাদা ও বালাশিম্পী খুবই ঘাবড়ে যান। শরীর কাঁপতে থাকে এবং ভয়ে গা দিয়ে ঘাম ঝরতে থাকে। বিজয়া-দশমীর দিন তাত্য়ার নাড়ীর বেগ কমে যায় এবং মনে হচ্ছিল যেন ওঁর মৃত্যু শিয়রে। ঠিক এই সময় একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটে। তাত্য়ার ফাঁড়া কেটে গেল। ওঁর প্রাণ বেঁচে গেল, পরিবর্ত্তে বাবাই চলে গেলেন। মনে হল যেন পরস্পর হস্তান্তরণ হয়ে গেল। সবাই বলে যে বাবা তাত্য়ার জন্য প্রাণত্যাগ করেন। এমনটি তিনি কেন করলেন সেটা শুধু তিনিই জানেন। এই কথাটি আমাদের বুদ্ধির বাইরে। এমনও হতে পারে যে, বাবা নিজের শেষ সময়ের ইঙ্গিত তাত্য়ার নাম নিয়ে দিয়েছিলেন।

পরের দিন ১৬ই অক্টোবর ভোরবেলা বাবা দাসগণুকে পন্ঢরপুরে স্বপ্ন দেন যে, "মস্জিদ হঠাৎ পড়ে গেছে। শিরডীর সব তেল-ওয়ালা আর মুদিরা আমায় উত্যক্ত করত। তাই আমি ঐ স্থান ছেড়ে দিলাম। আমি তোমায় এই বলতে এসেছি যে, তাড়াতাড়ি ওখানে গিয়ে আমায় সব রকমের ফুল দিয়ে ঢেকে দাও।" দাসগণু শিরডী থেকেও একটা চিঠি পান। উনি নিজের শিষ্যদের নিয়ে শিরডী আসেন এবং বাবার সমাধির সামনে অখন্ড কীর্তন ও হরিনাম জপ শুরু করেন। উনি নিজে ফুলের মালা গেঁথে ঈশ্বরের নাম নিয়ে বাবার সমাধিতে অর্পণ করেন। বাবার নামে খুব বড় দরিদ্র-নারায়ণ ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়।

লক্ষ্মীবাঈকে দান ঃ-

বিজয়া-দশমীর দিন হিন্দুদের জন্য খুবই পবিত্র। যদিও কিছুদিন থেকে বাবার খুব কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু আন্তরিক রূপে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। শেষ মুহূর্তের ঠিক আগে তিনি কারো সাহায্য না নিয়ে সোজা হয়ে ওঠে বসেন এবং তাঁকে দেখে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে হচ্ছিল। লোকেরা ভাবে- "যে ফাঁড়া কেটে গেছে এবং ভয়ের আর কিছু নেই। এবার বাবা শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন।" কিন্তু তিনি জানতেন যে এবার তাঁর যাবার সময় এসে গেছে। তাই তিনি লক্ষ্মীবাঈ শিন্দেকে কিছু দান দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন।

প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে বাবার বাস ঃ-

শ্রীমতি লক্ষ্মীবাঈ শিন্দে এক অবস্থাপন্ন ও মধুরস্বভবা মহিলা। উনি মস্‌জিদে বাবার দিন-রাত সেবা করতেন। ভগত মহালসাপতি, তাত্‌য়া ও লক্ষ্মীবাঈ ছাড়া রাতে মস্‌জিদের সিঁড়িতে কেউ পা রাখতে পারত না। একদিন সন্ধ্যার সময় বাবা যখন তাত্‌য়ার সাথে মস্‌জিদে বসেছিলেন সেই সময় লক্ষ্মীবাঈ এসে তাঁকে প্রণাম করেন। বাবা বললেন- "আরে লক্ষ্মী, আমার ভীষন ক্ষিধে পেয়েছে।" "বাবা, একটু অপেক্ষা করুন। আমি এক্ষুনি আপনার জন্য রুটি নিয়ে আসছি"- এই বলে লক্ষ্মীবাঈ বাড়ী ফিরে যান। একটু পরেই বাবার জন্য রুটি ও শাক নিয়ে এসে বাবার সামনে রাখেন। বাবা সেগুলি একটা ক্ষুধার্ত কুকুরকে দিয়ে দেন। তখন লক্ষ্মীবাঈ বলেন- "বাবা, এ কি? আমি আপনার জন্য নিজের হাতে রুটি বানিয়ে আনলাম। আপনি এক টুকরোও মুখে না দিয়ে সেটা কুকুরকে দিয়ে দিলেন? তাহলে আপনি আমায় শুধু-শুধু কষ্ট দিলেন কেন?" বাবা উত্তর দেন- "মিছিমিছি দুঃখ পেও না। কুকুরের ক্ষিধে শান্ত করা আমাকে তৃপ্ত করারই সমান। কুকুরেরও তো আত্মা আছে। প্রাণীদের আকৃতি-প্রকৃতি যদিও বিভিন্ন রকমের হয়, যেমন কেউ কথা বলতে পারে এবং কেউ মূক, কিন্তু ক্ষিধে তো সবারই পায়। এটা তুমি সর্বদা মনে রেখো যে, যে ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ায় সে আসলে আমাকেই খাওয়াচ্ছে। এটা একটা অকাট্য সত্য।" এই সাধারণ ঘটনাটির দ্বারা বাবা একটা মহান আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদান করেন যে, কাউকে মনে কষ্ট না দিয়ে কিভাবে আমাদের নিত্য ব্যবহার করা উচিত। এরপর লক্ষ্মীবাঈ রোজ প্রেম ও ভক্তিপূর্বক দুধ, রুটি ও অন্যান্য খাবার নিয়ে আসতে শুরু করেন এবং বাবাও সেগুলি ভালবেসে খেতেন। খানিকটা খেয়ে বাকীটা লক্ষ্মীবাঈকে দিয়ে রাধাকৃষ্ণমাঈয়ের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। রাধাকৃষ্ণমাঈ এই উচ্ছিষ্ট অন্ন প্রসাদ মনে করে প্রেমপূর্বক গ্রহণ

করতেন। এই রুটির ঘটনাটি অপ্রাসঙ্গিক ভাবা উচিত নয়। এতে দেখানো হয় যে সাইবাবা সর্বজীবে কি ভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েও তদুর্দ্ধে উঠেছিলেন। তিনি সর্বব্যাপী, জন্মমৃত্যুহীন এবং অমর।

বাবা লক্ষ্মীবাঈয়ের সেবা সদৈব মনে রাখেন। বাবা সে সব ভুলতেও বা কি করে পারতেন? দেহত্যাগের ঠিক আগে তিনি নিজের পকেটে হাত দিয়ে প্রথমে ৫ টাকা এবং পরে ৪ টাকা, - মোট ৯ টাকা ওঁকে দেন। এই ন'-য়ের সংখ্যা এই বইতে (অধ্যায় ১২) বর্ণিত নববিধা ভক্তির দ্যোতক। বা এটি সীমোল্লঙ্ঘনের সময় দেওয়া দক্ষিণাও হতে পারে। লক্ষ্মীবাঈ এক অর্থবতী মহিলা ছিলেন। ওঁর টাকার কোন অভাব ছিল না। তাই হতে পারে বাবা প্রধান রূপে ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের অন্তর্গত দশম অধ্যায়ে ষষ্ঠ শ্লোকের দিকে ওঁর দৃষ্টি আকর্ষন করতে চেয়েছিলেন। এই শ্লোকে[১] উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ভক্তদের ন'টি লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে পাঁচটি এবং পরে চারটি লক্ষণ ক্রমশঃ প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বাবাও সেই ক্রমই অনুসরন করেন (প্রথম ৫ এবং পরে ৪ মোট ৯)। কেবল ন' টাকাই নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী টাকা লক্ষ্মীবাঈয়ের হাতে আসা-যাওয়া করেছে। কিন্তু বাবার দেওয়া ন' টাকা উনি চিরকাল মনে রাখবেন।

শেষ মুহূর্ত্ত ঃ-

বাবা সব সময় সজাগ ও সচেতন থাকতেন এবং শেষ সময়ও সম্পূর্ণ সাবধান ছিলেন। তিনি সেই সময় সবাইকে সেখান থেকে চলে যেতে বলেন। কাকাসাহেব, শ্রীমান বুটী ও অন্যান্যরা- যাঁরা মস্‌জিদে বাবার কাছে বসেছিলেন, তাঁদেরও বাবা খাবার খেয়ে ফিরে আসতে বলেন। এই অবস্থায় ওঁরা বাবাকে একলা ছাড়তে চাইছিলেন না। কিন্তু বাবার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘনও তো করতে পারতেন না। তাই ওঁরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভারাক্রান্ত মনে 'ওয়াড়া'য় ফিরে গেলেন। ওঁরা জানতেন যে বাবার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন এবং এই ভাবে তাঁকে একলা ছেড়ে আসা ওঁদের উচিত হয়নি। ওঁরা খেতে তো বসেন কিন্তু মন পড়ে ছিল অন্য কোথাও (বাবার কাছে)। তখনও খাওয়া শেষ হয়নি আর বাবার নশ্বর শরীর ত্যাগ করার সংবাদ এসে পৌঁছয়। ওঁরা খাবার থালা ছেড়ে মস্‌জিদে দৌড়ন। সেখানে গিয়ে দেখেন যে, বাবা চিরকালের মত বায়াজী আপ্পাকোতের কোলে বিশ্রাম করছেন। তিনি না নীচে ঢলে পড়েন আর নাই তাঁকে বিছানায় শুতে হয়। নিজেরই আসনে শান্ত ভাবে বসে নিজের হাতে দান করার ভঙ্গিমায়

মানব শরীর ত্যাগ করলেন। সন্তরা স্বয়ংই দেহ ধারণ করেন এবং কোন নিশ্চিত লক্ষ্য নিয়ে এই জগতে প্রকট হন। যখন সেই লক্ষ্য পূরণ হয়, তখন যেমন সরল ও আকস্মিক ভাবে প্রকট হয়েছিলেন ঠিক সেই ভাবেই লুপ্ত হয়ে যান।

।। শ্রী সাঁইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

সপ্তাহ পারায়ণ ঃ ষষ্ঠ বিশ্রাম

১) অমান্যমৎসবো দক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ় সৌহৃদঃ।
অসত্বরোহর্থজিজ্ঞাসুরণসূয়ূর মোঘবাক্।।

৬ শ্লো, ১০অ, ১১স্ক (ভাগবৎ)

বঙ্গানুবাদ ঃ "গুরুসেবকের ধর্ম এই যে শিষ্য ব্যক্তি অভিমানশূণ্য, নিরহঙ্কৃত অনলস, মমতারহিত, সৌহৃদ্যবিশিষ্ট, অসত্বর, অর্থজিজ্ঞাসু, অসূয়াশূণ্য ও ব্যর্থালাপ রহিত হইবেন।"